দৈনিক ইনকিলাব
তারিখ ... 19 SEP 2012 ...
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ৬ ...

প্রবন্ধ

'শিক্ষা দিবস' ঃ ১৯৬২ থেকে ২০১২

অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ

স্বাধীনতার একচল্লিশ বছর পার হতে চলেছে। কিন্তু এখনও দেশের অর্ধেক অথবা তার কাছাকাছি মানুষ নিরক্ষর। অথবা বললাম এজন্য যে, সাক্ষরতার হার নিয়ে সরকারের ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার তথ্য পরিসংখ্যানের মধ্যে মিল যেমন নেই তেমনি সাক্ষরতা এখন আর আগের মতো শুধু সই করতে জানাও বুঝায় না। পড়তে ও লিখতে পারার সাথে, মোটামুটি হিসাব-নিকাশ করতে জানা বুঝায়। বর্তমানে আবার কম্পিউটার সাক্ষরতা কথারও প্রচলন হয়েছে। অর্থাৎ কম্পিউটার ব্যবহার করতে জানাও সাক্ষরতার সাথে সম্পর্কিত বলে এখন অনেকে মনে করেন। অন্যদিকে সাক্ষরতার সেকেলে ধারণা মেনে নিলেও যে গতিতে তা চলছে তাতে ২০১৪ সালের মধ্যে শতভাগ অর্জিত হবে কিনা তা নিয়ে সংশয় আছে।

১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর পূর্ব পাকিস্তানে শিক্ষার হার দ্রুত কমে যায়। খুব বেশী পরিমাণে ছাত্ররা বিদ্যালয় পরিত্যাগ করে। বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৪৭-৪৮ সালে পূর্ব পাকিস্তানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ২৯,৬৩৩। ১৯৫৪-৫৫ সালে তা ২৬,০০০ এ নেমে আসে। পশ্চিম পাকিস্তানে চিত্র ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। সেখানে শিক্ষার হার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বাড়ছিল, ড্রপ আউটের সংখ্যাও ছিল পূর্ব পাকিস্তানের তুলনায় কম। শিক্ষাখাতে সরকারী ব্যয়ও ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে বেশি। যদিও জনসংখ্যার ৫৬ শতাংশই বাস করতো পূর্ব পাকিস্তানে। ১৯৫৮ সালে সামরিক আইন জারির মাধ্যমে আইয়ুব খান পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হয়ে ৩০ ডিসেম্বর ১৯৫৮ তারিখে শিক্ষানীতি প্রণয়নের জন্য একটি কমিশন গঠনের ঘোষণা দেয়। ১৯৫৯ সালের ৫ জানুয়ারী কমিশনের কার্যক্রম উদ্বোধন হয়। পশ্চিম পাকিস্তান শিক্ষা বিভাগের সচিব ও আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে আইয়ুবের প্রাক্তন শিক্ষক এস এম শরীফকে চেয়ারম্যান করে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ৬ জন ও পূর্ব পাকিস্তান থেকে ৪ জনকে সদস্য করা হয়। ১৯৫৯ সালের ২৬ আগস্ট কমিশন অন্তর্বর্তী প্রতিবেদন পেশ করে। তা গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয় ১৯৬২ সালে।

শরীফ কমিশনের সুপারিশ : ১. 'উর্দুকে মুষ্টিমেয় লোকের পরিবর্তে জনগণের ভাষায় পরিণত করিতে হইবে' (শরীফ কমিশন প্রতিবেদন, পৃষ্ঠা-৩৪৯)। ২. ''পাকিস্তানের জাতীয় ভাষার জন্য যদি একটি সাধারণ বর্ণমালা প্রবর্তন করিতেই হয় তাহা হইলে আরবীর দাবী কিছুতেই উপেক্ষা করা যায় না।'' (পৃষ্ঠা-৩৭০)। ৩. ''শিল্পে মূলধন বিনিয়োগকে আমরা যে নজরে দেখি সেই নজরে শিক্ষা বাবদ অর্থ ব্যয়ের যৌক্তিকতা প্রতীয়মান হয়'' (পৃষ্ঠা-৩৯৫)। ''শিক্ষা সস্তায় পাওয়া সম্ভব নয়'' (পৃষ্ঠা-৩৯৬)। ৪. ''শিক্ষার জন্য জনসাধারণের নিকট হইতে খুব সামান্যই অর্থ সাহায্য পাওয়া গিয়াছে। প্রাথমিক স্কুল ও নামমাত্র বেতনের মাধ্যমিক স্কুল স্থাপনের জন্য সরকারের উপর নির্ভর করাই জনসাধারণের রীতি। তাহাদিগকে উপলব্ধি করিতে হইবে যে, অবৈতনিক শিক্ষার ধারণা বস্তুতঃ অবাস্তব কল্পনা মাত্র' (পৃষ্ঠা-৩৯৮)। ৫. ''ষষ্ঠ শ্রেণী হইতে ডিগ্রী পর্যন্ত ইংরেজী শিক্ষা বাধ্যতামূলক করিতে হইবে'' (পৃষ্ঠা- ৩৪৯)। ৬. শরীফ কমিশনের যে সুপারিশটি তাৎক্ষণিক কারণ হিসেবে ছাত্র-ছাত্রীদের আন্দোলনমুখী করে তোলে তা হলো ঃ ''বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষার মান উন্নত করিবার উদ্দেশ্যে আমরা অতীব জোরের সহিত সুপারিশ করিতেছি যে, স্নাতক ডিগ্রী কোর্সকে সম্প্রসারণ করিয়া তিন বছর মেয়াদী করা উচিত হইবে'' (পৃষ্ঠা-২৪)।

> সাক্ষরতার হার নিয়ে সরকারের ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার তথ্য পরিসংখ্যানের মধ্যে মিল যেমন নেই তেমনি সাক্ষরতা এখন আর আগের মতো শুধু সই করতে জানাও বুঝায় না। পড়তে ও লিখতে পারার সাথে, মোটামুটি হিসাব-নিকাশ করতে জানা বুঝায়। বর্তমানে আবার কম্পিউটার সাক্ষরতা কথারও প্রচলন হয়েছে। অর্থাৎ কম্পিউটার ব্যবহার করতে জানাও সাক্ষরতার সাথে সম্পর্কিত বলে এখন অনেকে মনে করেন। অন্যদিকে সাক্ষরতার সেকেলে ধারণা মেনে নিলেও যে গতিতে তা চলছে তাতে ২০১৪ সালের মধ্যে শতভাগ অর্জিত হবে কিনা তা নিয়ে সংশয় আছে

ছাত্র সমাজ শরীফ কমিশনের প্রতিবেদন প্রত্যাখ্যান করে আন্দোলন গড়ে তোলে। স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সকল স্তরের শিক্ষার্থীরা এতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে। তিন বছর মেয়াদি ডিগ্রী পাস কোর্সের বিপক্ষে ঢাকা কলেজের ডিগ্রীর প্রতিবন্ধী ছাত্র এম আই চৌধুরী আন্দোলনের সূচনা করে। ঢাকা কলেজের ডিগ্রীর ছাত্রদের সাথে বিভিন্ন কলেজের ডিগ্রীর ছাত্রদের এবং উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে ইংরেজীকে অতিরিক্ত বোঝা মনে করে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর পরীক্ষার্থীরাও এতে যোগ দেয়। বিচ্ছিন্নভাবে জুলাই পর্যন্ত আন্দোলন চলে। এতদিন ''ডিগ্রী স্টুডেন্টস ফোরাম'' আন্দোলন পরিচালনা করে আসছিল। এ সময় ''ডিগ্রী স্টুডেন্টস ফোরাম''-এর পরিধি সম্প্রসারণ ও নাম পরিবর্তন করে ''ইস্ট পাকিস্তান স্টুডেন্টস ফোরাম'' গঠন করা হয়। 'বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস' গ্রন্থে ড. মোহাম্মদ হান্নান লিখেছেন ঃ ''তবে আন্দোলনের গুণগত পরিবর্তন ঘটে ১০ আগস্ট (১৯৬২)। এদিন বিকালে ঢাকা কলেজ ক্যান্টিনে স্নাতক ও উচ্চ মাধ্যমিক উভয় শ্রেণীর ছাত্ররা এক সমাবেশে মিলিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা কলেজ ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক ছাত্র ইউনিয়ন নেতা কাজী ফারুক আহমেদ। তিনি তার বক্তৃতায় উপস্থিত ছাত্রদের একথা বুঝাতে সক্ষম হন যে, শিক্ষার আন্দোলন ও গণতন্ত্রের আন্দোলন একসূত্রে গাঁথা। এই সভার পূর্ব পর্যন্ত ছাত্র সংগঠনগুলির কেন্দ্রীয় নেতাদের সঙ্গে কমিশন বিরোধী আন্দোলনের কোন যোগসূত্র ছিল না। কেন্দ্রীয় নেতারা মনে করতেন, শুধু শিক্ষা সংক্রান্ত দাবী-দাওয়া নিয়ে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলা অসম্ভব''।

১০ আগস্টের এই সভায় ১৫ আগস্ট সমগ্র প্রদেশে সাধারণ ধর্মঘট পালন এবং আন্দোলনের পরবর্তী কর্মসূচী হিসাবে ১০ সেপ্টেম্বর সচিবালয়ের সামনে ছাত্রদের অবস্থান ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ১৫ আগস্ট থেকে ১০ সেপ্টেম্বর সময়ের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আমতলায় বেশ কয়েকটি ছাত্রসভা ও বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা প্রতিদিন ব্যাপক সংখ্যায় এতে অংশগ্রহণ করে। ১০ সেপ্টেম্বরের পূর্বপ্রস্তুতি হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাফেটেরিয়ায় সকল প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা এক সভায় মিলিত হয়। এতে যোগদান করেন ডাকসুর পক্ষে এনায়েতুর রহমান, জামাল আনোয়ার বাসু, ঢাকা কলেজ ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক কাজী ফারুক, জগন্নাথ কলেজ ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতি আব্দুল্লাহ ওয়ারেস ইমাম, ইডেন কলেজ সংসদের সহ-সভানেত্রী মতিয়া চৌধুরী, নাজমা বেগম, কায়দে আযম কলেজ সংসদের সহ-সভাপতি নুরুল আরেফীন খান, তোলারাম কলেজ (নারায়ণগঞ্জ) সংসদের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আজিজ বাগমার প্রমুখ। কাজী ফারুক (ছাত্র ইউনিয়ন) ও আব্দুল্লাহ ওয়ারেস ইমাম (ছাত্রলীগ) ইস্ট পাকিস্তানের স্টুডেন্টস্ ফোরামের যুগ্ম আহ্বায়ক নির্বাচিত হন। ...আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু এতোদিন ছিল স্কুল কলেজগুলি। এখন তা চলে আসলো বিশ্ববিদ্যালয়ের দোরগোড়ায়। পূর্ব পাকিস্তান সরকার এক প্রেসনোটে ১০ সেপ্টেম্বর সচিবালয়ের অবস্থান ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের আহ্বান জানায়। অন্যথায় পরিস্থিতি মারাত্মক হবে বলে হুমকি দেয়। কৌশলগত কারণে ১০ সেপ্টেম্বর কর্মসূচী প্রত্যাহার করা হলেও ছাত্ররা ১৭ সেপ্টেম্বর হরতালের ডাক দেয়।

১৭ সেপ্টেম্বর খুব ভোর থেকেই ছাত্ররা পিকেটিং শুরু করে। পিকেটিংয়ের আওতায় পড়ে মোনায়েম মন্ত্রিসভার সদস্য হাসান আসকারীর মার্সিডিজ গাড়ী ভস্মীভূত হয়। একই সঙ্গে জ্বলতে থাকে দু'তিনটি জীপও। ছাত্রদের সাথে বিভিন্ন স্তরের মানুষও বিক্ষোভে যোগ দেয়। সার্জেন্ট হাফিজের নেতৃত্বে একদল পুলিশ নবাবপুর রেল ক্রসিং থেকে সদরঘাট পর্যন্ত বিক্ষোভকারীদের ধাওয়া ও গ্রেপ্তার করেও সামাল দিতে পারছিল না। সকাল ৯টা না বাজতেই সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা লোকে লোকারণ্য হয়ে যায়। এমন সময় খবর আসে নবাবপুরে গুলি হয়েছে, এবং কয়েকজন তাতে শহীদও হয়েছে। তৎক্ষণাৎ ছাত্র-জনতার সমাবেশে এক অগ্নিশিখার ঢেউ বয়ে যায়। সিরাজুল ইসলাম খান, মহিউদ্দীন আহমেদ, হায়দার আকবর খান রুণো, রাশেদ খান মেনন, আইয়ুব রেজা চৌধুরী, রেজা আলী চৌধুরী প্রমুখের নেতৃত্বে বের হয় জঙ্গী মিছিল। মিছিল যখন হাইকোর্ট পার হয়ে আব্দুল গনি রোডে প্রবেশ করছিল তখন পিছন থেকে পুলিশ গুলি বর্ষণ করে। নিহত হয় বাবুল এবং গোলাম মোস্তফা। আহত হয় ওয়াজিউল্লাহ। সে হাসপাতালে পরের দিন মৃত্যু বরণ করে। অনেকে আহত হয়। রথখোলার সামনে মিছিল পৌঁছলে দেখা যায় কয়েক হাজার পুলিশ ঐ মিছিলের উপর বারিকেড সৃষ্টি করেছে। ব্যারিকেডের অপর পাশে জগন্নাথ কলেজের দিক থেকে অপর একটি বিরাট মিছিল। দুটি মিছিল যাতে মিলতে না পারে সেই জন্য এই ব্যবস্থা। ব্যারিকেড ভাঙার জন্য একপর্যায়ে চললো ইষ্টক বৃষ্টি। সামান্য হটে যেতে বাধ্য হলো সেনাবাহিনী ও পুলিশ। পরে এলোপাতাড়ি গুলি ও টিয়ার গ্যাসে আক্রান্ত হয়ে বিক্ষোভকারীরা হটে যেতে বাধ্য হয়। আহত হয় অসংখ্য। এ দিনের বিক্ষোভ মিছিলে বুড়িগঙ্গার ওপাড় থেকে নৌকার মাঝিরাও বৈঠা হাতে মিছিল নিয়ে আসে। শহীদ সোহরাওয়ার্দীর করাচি থেকে ঢাকায় এসে গভর্নর গোলাম ফারুকের সাথে সাক্ষাতের পর শরীফ শিক্ষা কমিশন রিপোর্টের বাস্তবায়ন স্থগিতের ঘোষণা দেওয়া হলে এক পর্যায়ে আন্দোলন স্তিমিত হয়ে আসে। (আগামীবারে সমাপ্য)

লেখক : বাষট্টি শিক্ষা আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক
প্রবীণ শিক্ষক নেতা